শূদ্রক ও শরৎচন্দ্র

দুলাল ভৌমিক

তুলনা সাধারণতঃ একই জাতের জিনিসের মধ্যেই হয়ে থাকে। সাহিত্যে যেমন—নাটকের সঙ্গে নাটকের, কাব্যের সঙ্গে কাব্যের, কবির সঙ্গে কবির, নাট্যকারের সঙ্গে নাট্যকারের ··· ইত্যাদি। কিন্তু এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের তুলনা হয় না। তবে এক দিক থেকে ভিন্ন জাতের মধ্যেও তুলনা হতে পারে—সেটা হচ্ছে, বিষয়বস্তু। সাহিত্যিকের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়-বস্তু চিত্তাকর্ষক ক'রে পাঠকের সম্মুখে পরিবেশন করা। খাবার পরিবেশকের কাজ এবং উদ্দেশ্য—খাবার পরিবেশন করা, তা তিনি যে রকম পাত্রেই করুন না কেন। ঠিক তেমনি সাহিত্যিকের কাজ হল সাহিত্যবস্তু পরিবেশন করা, তা তিনি নাটকের আকারেই করুন আর কাব্যের আকারেই করুন কিংবা অন্য কোন প্রকারেই করুন, যে ভাবেই করুন না কেন পরিবেশিত বস্তুর সার্থকতাই হচ্ছে বড় কথা। তাই পরিবেশিত বস্তুর দিক থেকে এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের তুলনা হতে পারে। এখানেও এ-ধরনেরই অর্থাৎ ভিন্ন জাতের মধ্যে একটি তুলনা দেখানোর প্রয়াস পাচ্ছি।

শূদ্রক হচ্ছেন সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বিখ্যাত দৃশ্যকাব্যকার বা রূপক-কার,[১] আর শরৎচন্দ্রের প্রধান পরিচিতি হচ্ছে—তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। একজন রূপককার অন্যজন উপন্যাসকার। এঁদের মধ্যে তুলনা করার দু'টি কারণ—এক : উভয়ের সাহিত্যকর্মের উপ-জীব্য বিষয় এক জাতের। দুই : শূদ্রকের সাহিত্যকর্ম মাত্র একটিই (অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়েছে), সেটি রূপক—'মৃচ্ছকটিক'। রূপককার হিসেবেই শূদ্রকের একমাত্র পরিচয়। আর এই রূপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের রচনার মিল রয়েছে। শূদ্রক ও শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে যে মিল আছে অর্থাৎ শূদ্রকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে তুলনা হতে পারে—এ মতের স্বীকৃতি

আমরা কমলকুমার সান্যালের কথায়ও পাই। তিনি লিখেছেন—"(মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন) বেশ্যাদেরও যে হৃদয় আছে, তারাও ভালবাসতে জানে এ পরিচয় আমরা পেয়েছি আধুনিক যুগে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। শরৎচন্দ্রের বহুবছর পূর্বে সে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন নাট্যকার শূদ্রক।"—মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসের মূল্যায়ন, পৃ. ২৩-২৪। এতদ্ব্যতীত মৃচ্ছকটিকে আরও অনেক ঘটনা ও চরিত্র রয়েছে যার সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের অপূর্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—যার ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে তুলনা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

শরৎচন্দ্রকে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর জন্য 'জনদরদী' ও 'কথাশিল্পী' ভূষণে ভূষিত করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের লেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রধানতঃ সমাজ। তিনি সমাজ নিয়েই গবেষণা করেছেন। তৎকালে গোঁড়া হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের লোকদের কি দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল; সমাজপতিদের চাপে পড়ে এসব হতভাগ্যদের জীবন কিভাবে নিষেপষিত হয়ে নিঃশেষিত হত সে-সব ঘটনাই শরৎচন্দ্র বেদনামিশ্রিত কথার সাহায্যে একান্ত আপনার করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় এসব তাঁর নিজের জীবনেই সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর মা, তাঁর বাবা; তাঁর ভাই, তাঁর বোন এবং তিনি নিজেও যেন এ-সব মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। শরৎ-সাহিত্য পড়ে পাঠক অতি-সহজেই শরৎচন্দ্রকে আপনজনের মত আপনহৃদয়ের একান্ত আপন জায়গায় স্থান করে দেয়। তাই তাঁকে 'জনদরদী' ও 'কথাশিল্পী' বলা হয়েছে। মূলতঃ তিনি তা-ই।

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায়—প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এমন 'জনদরদী' ও 'কথাশিল্পী'র শুভাগমন ঘটেছিল। তিনি হচ্ছেন শূদ্রক। তিনি রাজা ছিলেন এবং একশত বছর ও দশ দিন বেঁচে থেকে স্বীয় পুত্রকে রাজা দেখে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং অগ্নিতে আহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।[২] শূদ্রকের জন্ম সম্পর্কে মতান্তর আছে। তবে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রমাণাদির দ্বারা খ্রীস্টাব্দ ৬ষ্ঠ শতককে শূদ্রকের কাল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

শূদ্রক একটিমাত্র রূপকই রচনা করেছিলেন—মৃচ্ছকটিক।[৩] এখানে আমরা দেখি দরিদ্র ও সমাজের নিম্নবর্ণের ও নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি তাঁর সহৃদয় সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা। শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় কেবল এদের অবহেলিত জীবনের দুঃসহ অবস্থাটাই বর্ণনা করেছেন; এদের দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন কিন্তু দুঃখ-মোচনে, দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন করতে সাহস করেননি; কিংবা এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতেও সাহস পাননি। শূদ্রক তা করেছেন। তিনি এদের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, দায়ী ও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং অবিচারের প্রতিকারও করেছেন। শূদ্রকের জন্ম ৬ষ্ঠ খ্রীস্টাব্দে। সেই সময়ে তিনি সমাজের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে যা বলেছেন, যা করেছেন, বিংশ শতাব্দীতে এসেও শরৎচন্দ্র তা বলতে পারেননি, করতে পারেন নি। শরৎ-চন্দ্রের লেখায় নারীদের দুরবস্থার কথাই বেশী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর লেখায় দেখি নারী তার মনের বাসনা প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছেনা; দুঃখে-শোকে তাদের বুক ফেটেছে কিন্তু মুখ ফোটেনি; অকারণ কিংবা অন্যের কারণে কিংবা মিথ্যা কারণে তারা স্বর্গ থেকে নরকে পতিত হয়েছে, স্বামীর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিংবা মনের মানুষকে অর্থাৎ অন্তরে যাকে ভাল-বেসেছে—স্বামীত্বে বরণ করেছে, সমাজের চাপে বাইরে তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি, সাহস পায়নি; শুধু আত্মদহনে জ্বলে-পুড়ে এক একটা সোনার জীবন কিছুমাত্র ভস্মাবশেষ রেখে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। 'শ্রীকান্তে' দেখা যায় রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বাল্যকাল থেকে ভালবেসে এসেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বলতে পারেনি, কারণ তারা ছিল গরীব। সমাজের বিধি-মত যৌবনে এক পাঁচক ব্রাহ্মণের সঙ্গেই দু'বোনের কোন রকমে বিয়ে হয়। বিয়ে তো নয়—এ হচ্ছে অবিবাহিত থাকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। ঘটনাও তা-ই। স্বামীটি তাদের 'পণ'-এর টাকা ক'টি নিয়ে একদিন উধাও হয়। বিবাহিত জীবনের কি স্বাদ—তা তারা বুঝতে পারেনি। পরে হরিলক্ষ্মীর মৃত্যু হয় এবং রাজলক্ষ্মী ব্রাহ্মণ-কন্যা হয়েও পেটের দায়ে বাঈজীর জীবন বেছে নেয়, কিন্তু স্ত্রীর অধিকার নিয়ে স্বামীকে সে খুঁজে বের করতে পারেনি, পারেনি ধর্মমতে বিবাহিত স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। তবে আশ্চর্যের বিষয়—বাঈজী হলে কি হবে, হাজার পরপুরুষের সঙ্গে হাজার অভিনয় করেও রাজলক্ষ্মী তার অন্তরের

দেবতাকে, ভালবাসার ব্যক্তিকে (শ্রীকান্ত ৪) অন্তরে বাঁচিয়ে-ই রেখেছে—"কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইলনা, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শত কোটি মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোনখানে জীবিত রাখিয়াছিল ? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত ? কোন পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত ?"—(শ্রীকান্ত, প্রথমপর্ব)। শ্রীকান্ত অবশ্য বাল্যকালে রাজলক্ষ্মীর মনের কথা জানতে পারেনি, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করে যখন পিয়ারী বাঈজী ওরফে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন জানতে পেরেছে এবং কালক্রমে রাজলক্ষ্মীর প্রতি নিজের মনের কথাও জানতে পেরেছে। রাজলক্ষ্মীর সাহচর্য্যে এসে শ্রীকান্তের মন কখনো কখনো অস্বাভাবিক দুর্বল হয়ে পড়েছে—ভেবেছে, যে যা বলে বলুক—রাজলক্ষ্মীকে সে গ্রহণ করবে। কিন্তু পরক্ষণেই সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনদের কথা স্মরণ করে আর পা বাড়াতে সাহস পায়নি। তখন ভেবেছে—সে ব্রাহ্মণ-পুত্র, গলে এখনও পৈতে ঝুলছে; রাজলক্ষ্মী পতিতা, বাঈজী, পিয়ারী বাঈজী। তাই রাজলক্ষ্মীকে ভালবাসলেও, রাজলক্ষ্মীর জন্য মন কাঁদলেও পিয়ারী বাঈজীকে সে ঘরে তুলতে শেষ পর্যন্ত সাহস পায়নি। শরৎচন্দ্র সাহস পাননি প্রেমের যথার্থ মূল্য দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে পিয়ারী বাঈজী থেকে সমাজে তুলতে; শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে।

অন্নদা দিদিকে দেখি, সামাজিক বিধিমতে বিবাহিত স্বামীর সঙ্গেই ঘর ছেড়ে এলেও পরে আর সমাজে ফিরে যেতে পারেননি। বনে-জঙ্গলে তাদের মনুষ্যেতর জীবন যাপন করতে হয়েছে। সেখানেই স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি চিরতরে সকলের কাছ থেকে দূরে সরে যান। আপন পিতৃগৃহে যাওয়ার সাহসও তার ছিল না। কিন্তু তার দোষ কি ছিল ? তিনি তো তার স্বামীর সঙ্গেই ঘর ছেড়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাকেও আর লোক-সমাজে ফিরিয়ে নিতে পারলেন না।

'দেবদাস'-এ দেখি আবাল্য ঘনিষ্ঠ প্রেম-ভালবাসা থাকলেও দেবদাস-পার্বতীর মিলন হলনা, কারণ দেবদাসের পিতা জমিদার। কিন্তু পার্বতীরা ছোটঘর। দেবদাস পার্বতীকে না পেয়ে গেল চন্দ্রমুখীর কাছে। চন্দ্রমুখী পতিতা। দেবদাস প্রথমে তাকে গালি দিয়েছে, ঘৃণা করেছে। পরে অবশ্য

তাকে ভালবেসেছে, 'বৌ' বলে সম্বোধন করেছে; মনের জ্বালা জুড়াতে বারবার তার কাছে ছুটে গিয়েছে। কিন্তু এখানেও সেই ব্রাহ্মণত্ব, সেই সমাজের ভয়। পারেনি দেবদাস চন্দ্রমুখীকে সত্যিকারের 'বৌ' হিসেবে ঘরে তুলতে। চন্দ্রমুখীও তাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছে। তার জন্য সে পতিতা-বৃত্তি পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু চন্দ্রমুখীর মনোবাসনা কি পূর্ণ হয়েছে? ——হয়নি, কারণ চন্দ্রমুখী যে সমাজ-ভ্রষ্টা আর দেবদাস জমিদার পুত্র, ব্রাহ্মণ-পুত্র। ভালবাসার মূল্য কি? এখানে যে জাতের মূল্য আর পেশার মূল্যই সব। দেবদাস এগুতে পারেনি তার বংশ মর্যাদার বাধায় আর চন্দ্রমুখী পারেনি তার নিকৃষ্ট অবস্থার জন্য। অথচ বুকে তার হাজার কথা, লক্ষ বাসনা, কিন্তু মুখে তার একটা কথাও জোগায়নি। শরৎচন্দ্র এখানেও পারেননি চন্দ্রমুখীর মুখে 'কথা' দিয়ে তাকে জাতে তুলতে।

'চন্দ্রনাথ'-এ দেখি নিরপরাধিনী সরযূ মায়ের দোষের জন্য স্বামীর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তার মায়ের অপরাধ——তিনি না-কি স্বামীর মৃত্যুর পরে পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাতে সরযূর দোষ কি? কিন্তু দোষ থাক-না-থাক মায়ের দোষে তাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিরাশ্রয় হতে হয়েছে। তা-ও পরে খোঁজ করে জানা গেল তার মায়েরও কোন দোষ ছিলনা। নিজের মিথ্যে অপবাদের জন্য জামাইয়ের ঘরে মেয়ের সুখে বিঘ্ন ঘটতে পারে এই ভয়ে সরযূর মা নিরুদ্দেশ পর্যন্ত হয়েছেন। অথচ সত্য ঘটনা বলে মিথ্যার প্রতিবাদ করার সাহস কিংবা শক্তি সমাজ তাকে দেয়নি। মা-মেয়ে উভয়েই সে অপমানের জ্বালা নীরবে সহ্য করেছে। পরে অবশ্য চন্দ্রনাথ সরযূকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সরযূর তাতে লাভ কতটুকু হল? অপমানিতা তাকেই হতে হয়েছে; গর্ভাবস্থায় স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তাকেই পথে নামতে হয়েছে। অথচ স্বামীভক্তিকে সে মন থেকে কখনই মুছে ফেলতে পারেনি, পারেনি অকারণে স্বামীর এ হেন নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদ করতে। চন্দ্রনাথের ভুল না ভাঙলে ঐ অবস্থায়ই সরযূর দিন কাটত। সে নিজে পারত না তার ভাগ্য ফেরাতে, পারতনা নিজের সত্য পরিচয়কে তুলে ধরে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে।

'পণ্ডিতমশাই'-এ দেখি পাঁচ বছর বয়সের সময় বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের বিবাহ হয়। কিছুদিন পরেই কুসুমের বিধবা মায়ের নামে মিথ্যা কলংক

ওঠে। সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই কুসুমের শ্বশুর তাকে তাড়িয়ে দেয়। কুসুমের দোষ তো নেই-ই, তার মায়ের দোষও যথার্থ নয়, তথাপি নিরপরাধিনী কুসুম স্বামীসুখে বঞ্চিত হল; জোর করে আনাড়ী সমাজ তার কপাল থেকে স্বামীসুখ ছিনিয়ে নিল। পিতার মৃত্যুর পরে বৃন্দাবন অবশ্য কুসুমকে পুনরায় গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কুসুমের বয়স তখন ১৫/১৬। কুসুমেরও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তখনও স্বামীর ঘরে যেতে হলে কুসুমকে অনর্থক কি কি ক্রিয়া (প্রায়শ্চিত্ত) করতে হবে এই ভেবে কুসুম রাজী হয়নি। এখানেও কুসুম সমাজের ভয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেনি। আপনার জ্বালা আপনার মনে রেখেই দিন কাটিয়েছে। এমনি আরও কত রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, কত অন্নদাদিদি, কত কুসুম-সরযূর অবহেলিত নিষ্পেষিত ও বেদনাদায়ক কাহিনী শরৎচন্দ্রের লেখনীতে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাদের কারো মুখেই ভাষা দিতে পারেন নি। তিনি শুধু অঙ্গুলী নির্দেশ করে এদের দুঃসহ পরিবেশ ও মর্মবিদারক অবস্থায় দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারেন নি বা তার কোন পথও নির্দেশ করতে পারেন নি।

শূদ্রক কিন্তু তা পেরেছেন এবং নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় ও যথার্থভাবেই পেরেছেন। তাঁর রচিত 'মৃচ্ছকটিক' দশ অংকের একটি রূপক। এর নায়ক চারুদত্ত। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ এবং বৃত্তিতে বণিক। এক সময় অর্থ-সম্পদ ও যশে-মানে তিনি উজ্জয়িনীর সর্বোচ্চ আলোচিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এখন অর্থ-সম্পদে ভাটা পড়েছে, তবে যশ-মান পুরোপুরি টিকে আছে। এখনও তাঁর নামে লোকে মাথা নত করে; দুষ্টরা ভয়ে চমকে উঠে, যেমন চমকে উঠে গরুড়ের ভয়ে সর্পকুল।

অপরদিকে 'মৃচ্ছকটিকে'র নায়িকা হলেন বসন্তসেনা—গণিকা-সমাজের একেবারেই নিম্নস্তরের লোক। সমাজে তার এটাই একমাত্র পরিচয়। বসন্ত-সেনা অবস্থাসম্পন্না; ঘরে বৃদ্ধা মা আছেন। তার পিতার কোন পরিচয় এখানে পাওয়া যায়না।

বসন্তসেনা একবার বসন্তোৎসবে চারুদত্তকে দর্শন করেন। ইতিপূর্বে চারুদত্তের কথা তিনি লোক মুখে অনেক শুনেছেন। তাতেই তাঁর প্রতি

শ্রদ্ধায় তার মাথা সর্বদা অবনত থাকত। মনে মনে তাঁকে অত্যন্ত আপন-জন মনে করতেন। বসন্তোৎসবে দেখার পর তিনি তাঁকে আপন-হৃদয়ে স্থান দেন। চারুদত্ত একথা জানতেন না—অনেক পরে জেনেছেন। এদিকে তাঁর ঘরে স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, তথাপি তিনি গণিকার বাসনা অপূর্ণ রাখলেন না। তিনি বসন্তসেনার ভালবাসার মূল্য দিয়েছেন; নির্দ্বিধায় সমাজবিধিমতে বসন্তসেনাকে বিবাহ করেছেন। দশম অংকে দেখি রাজা[৪]ও তাদের এ সম্পর্ক সানন্দে অনুমোদন করেছেন "আর্যে বসন্তসেনে পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূ-শব্দেনানুগৃহ্নাতি।"—আর্যে বসন্তসেন! রাজা সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে 'বধূ' শব্দের দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন, অর্থাৎ আপনাদের সম্পর্কের প্রতি রাজা সানন্দে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমাজ এখানে নীরব। সমাজ কোন বাধা দেয়নি। অবশ্য সমাজের কোন বাধা ছিল কিনা তা আমরা 'মৃচ্ছকটিকে' স্পষ্ট জানতে পাইনা, তবে এটুকু বুঝতে পারি যে, এ ধরনের ঘটনার প্রতি সমাজের স্বাভাবিক স্বীকৃতি ছিল না। কারণ তা থাকলে বিশেষ ভাবে রাজা আবার কেন এতে স্বীকৃতি দিতে যাবেন? সমাজের যেটা সাধারণ নিয়ম তার প্রতি তো কারও বিশেষ ধরনের সহানুভূতির প্রয়োজন পড়েনা। অতএব, এর থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সমাজেও গণিকাদের গৃহবধূর মর্যাদা লাভের ব্যাপারটা সহজভাবে স্বীকৃত ছিলনা, কিন্তু শূদ্রক তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে রাজার মাধ্যমে সমাজে তা' প্রচলিত করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন—এটা হওয়া দরকার এবং এটা হ'তে গেলে রাজশক্তির সহায়তা প্রয়োজন, তা না হলে সমাজ-পতিরা মারমুখো হয়ে আসবে।

সমাজের কথা থাক, গণিকা বসন্তসেনাকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করাতে সমাজের এতবড় একজন নামী-দামী ব্যক্তি হয়েও স্বয়ং চারুদত্তের মনে কখনো কোন ভয়, সংকোচ, দ্বিধা বা অপমানের কথা জাগেনি। সানন্দে এবং সসম্মানে তিনি বসন্তসেনার পাণি গ্রহণ করেছেন। চারুদত্তের প্রথমা স্ত্রী ধূতা-ও বসন্তসেনাকে ভগিনী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এ গেল চারুদত্তের কথা। চারুদত্তকে ভালবাসে বলে বসন্তসেনার মধ্যেও কোন ভয়, লজ্জা, সংশয়, সংকোচ ছিলনা। তিনি নিজে একজন গণিকা। অপর দিকে চারুদত্ত ব্রাহ্মণ, সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—

এজন্য তিনি নিজেকে কখনো ছোট মনে করেন নি, চারুদত্তের কৃপা-ভিখারিণী মনে করেন নি, হীনমন্যতায় ভোগেননি। তার মতাদর্শ হল—তিনি চারুদত্তকে ভালবাসেন। চারুদত্ত তার ভালবাসার মূল্য একমাত্র ভালবাসা দিয়েই দিতে পারেন। বসন্তসেনা ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসাই কামনা করেন---আর কিছু নয়। অতএব, এখানে নিজেকে ছোট মনে করা বা হীনমন্যতায় ভোগার কোন কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাছাড়া তিনি যে একজন গণিকা—এজন্যও মনে তার কোন সংকোচ নেই, কারণ ভালবাসার রাজ্যে সব সমান—এখানে ছোট-বড় বা উচ্চ-নীচ নেই ; এখানে কোন জাতের বিচার, পেশার বিচার নেই। তাই দ্বিতীয় অংকে দেখি---বসন্তসেনার কাছে তার পরিচারিকা মদনিকা জানতে চেয়েছে—কে সেই রাজা বা রাজবন্ধু—বসন্তসেনা যার সেবা করতে চায়, অর্থাৎ বসন্তসেনা কার প্রেমে পড়েছেন। এ কথার উত্তরে বসন্তসেনা বলেছেন---তিনি কাউকে সেবা করতে চাননা। তিনি চান কাউকে উপভোগ করতে অর্থাৎ কারো সঙ্গে (তার ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে, তার প্রেমিকের সঙ্গে) যৌবন সুখ উপভোগ করতে"---(চাটি রম্ভু নিচ্ছামি ন সেবিতুম্।"—বসন্তসেনা।) অর্থাৎ, বসন্তসেনার কথা হল—তিনি তো চারুদত্তের ক্রীতদাসী নন যে তাকে কেবল সেবা করেই খুশী হবেন। চারুদত্ত তার ভালবাসার পাত্র। তাঁর মধ্যে তার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ এক কথায় তার জীবনের সব কিছু কেন্দ্রীভূত। চারুদত্ত তার জীবন-সাথী, বন্ধু—প্রভু নন। অতএব, তিনি শুধু তার সেবাই করবেন কেন—তাঁর কাছে সুখ-দুঃখের কথাও বলবেন ; তাঁকে নিয়ে জীবন-যৌবন, সুখ-আনন্দ সবই উপভোগ করবেন। সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে একজন গণিকার মুখে শূদ্রক এমন সাহসিকতাপূর্ণ ও গর্বের বাণী জুগিয়েছেন। এটা কি আজও সম্ভব হচ্ছে? এই বিংশ শতাব্দীতেও কি মানুষ মানুষকে এতখানি সম্মান দিচ্ছে? আজ গণিকাদের মানুষ ইচ্ছামত ব্যবহার করছে অথচ তাদের সঙ্গে সংশ্রব আছে একথা কেউ স্বীকার করবে না বরং উল্টো তাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে পালাবে। এ জীবন থেকে তাদের উদ্ধার করতেও কেউ এগিয়ে আসবেনা বরং কি করে ভদ্র-সন্তানকে এই নিকৃষ্ট জীবনে ঠেলে দেয়া যায় অহরহ তারই চেষ্টায় হাটে-বাজারে অলিতে-গলিতে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে। শূদ্রক নিজে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর হাতে সমাজের অনেকখানি নির্ভর

করত। তিনিই যা করে যেতে পেরেছেন আধুনিক যুগে এসেও শরৎচন্দ্র তা করতে সাহস পাননি।

মদনিকা বসন্তসেনার ক্রীতদাসী। জাতিতে সে কি তা অজ্ঞাত। তবে তার একমাত্র পরিচয় হচ্ছে—সে একজন গণিকার টাকার কেনা দাসী। ব্যক্তি হিসেবে সে নিশ্চয়ই নিম্ন স্তরের। কিন্তু তাকেও পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছে এক ব্রাহ্মণ-কুমার শর্বিলক। প্রেমিকার মুক্তি-পণ দেয়ার জন্য নিঃসম্বল শর্বিলক ব্রাহ্মণ হয়েও চুরি পর্যন্ত করেছে। প্রেমের মূল্য তার কাছে এতখানি। প্রেমিকাকে পেতে হবে—এ-ই ছিল তার মূলমন্ত্র। তাতে যা করতে হয় তা-ই করতে সে প্রস্তুত; করেনি সমাজের ভয়, করেনি অপমানের ভয়, করেনি জাত্যভিমান। শরৎ-সাহিত্যের কোথাও এমন অসম্ভব মিলন দেখা যায় না। শরৎচন্দ্র পাঠককে আকাশের চাঁদ দেখিয়েছেন, সরোবরের শশি-পাগলিনী কুমুদিনীকেও দেখিয়েছেন কিন্তু উভয়ের মধুর মিলন দেখাতে সাহস করেন নি। 'বড়দিদি'-তে শরৎচন্দ্র অকাল বিধবা বড়দিদি মাধবী এবং নব্য মাষ্টারমশাই সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে গভীর প্রেম দেখিয়ে দুই হৃদয়ের মাঝখানে সমাজের কঠিন বেড়া তুলে দিয়েছেন—মিলন দেখাতে পারেন নি। 'দেবদাসে' দেবদাস-পার্বতীতে আবাল্য প্রেম দেখিয়েছেন; একজনকে মেরেই ফেললেন (দেবদাসের মৃত্যুর এক মাত্র কারণ পার্বতীকে না পাওয়া), আর একজনকে চল্লিশোর্ধ এক বৃদ্ধের ঘরে পাঠিয়ে জীবন্মৃত করে রেখেছেন, অথচ বংশমর্যাদার বাঁধ ভেঙ্গে 'দু'টি হৃদয়ে একটি আসন' পাততে সাহস পেলেন না। শরৎচন্দ্র মানবহৃদয়ের ঘা-টাই শুধু দেখিয়েছেন—পুনঃ পুনঃ তাতে আঘাত দিয়ে বেদনাই শুধু বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আরোগ্য লাভের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে শূদ্রক তা করেছেন। মদনিকা বসন্তসেনার ক্রীতদাসী হলেও তিনি যখনই মদনিকা-শর্বিলকের প্রেমের কথা জানতে পারলেন তখনই মুক্তিপণ ব্যতীতই মদনিকাকে শর্বিলকের হাতে তুলে দিলেন। মদনিকা-শর্বিলকের মিলন-পথে বাধা ছিল বসন্তসেনার কাছে মদনিকার দাসীত্ব। এ নিয়ে তারা ভীত ও সংশয়ান্বিত-ও ছিল। বসন্তসেনা ইচ্ছে করলে মদনিকাকে মুক্তি না-ও দিতে পারতেন—তাতে কারো কিছু করার ছিল না। কিন্তু বসন্তসেনা তা করেন নি। নারী হয়ে নারীর মনোব্যথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। এমন মানবপ্রীতি ও সহানুভূতি সত্যিই দুর্লভ।

তাছাড়া বসন্তসেনার কথাই ভাবা যাক না। বসন্তসেনা গণিকা অথচ সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি চারুদত্তকে ভালবেসে নিশ্চয় দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। শূদ্রক তার মনোবাসনা ও মনোব্যথা বুঝতে পেরেছেন। তাই নির্দ্বিধায় এবং নিঃসংকোচে তিনি তার ভালবাসাকে সার্থক ক'রে তুলেছেন। শূদ্রক 'বসন্তসেনা'-চরিত্রটির দ্বারা এ কথাই ঘোষণা করেছেন যে, জন্মের দ্বারা নয় কর্মের দ্বারাই প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত আর এটাই সাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা। বসন্তসেনা গণিকা। গণিকাদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে অধিকাংশরই ধারণা হীন। সাধারণতঃ অর্থের প্রতি এদের লোভ দেখা যায়। কিন্তু বসন্তসেনা এ ক্ষেত্রে এক চরম ব্যতিক্রম। তার অর্থের প্রতি কোন লোভ নেই। পতিতা তাদের জাত-ব্যবসায়, তাই তিনি করতেন। কিন্তু চারুদত্তকে ভালবাসার পরে এ বৃত্তি তিনি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অংকে দেখি—রাজশ্যালক শ-কার (সংস্থানক) অনেক মূল্যবান অলংকার সহ গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে বসন্তসেনাকে নিয়ে যেতে। এদের প্রতি বসন্তসেনার চরম ঘৃণা। কিন্তু বসন্তসেনার মা তাকে আদেশ করেছেন শ-কারের সঙ্গিনী হতে। মায়ের কথার উত্তরে ক্রোধের সাথে বসন্তসেনা বলেছেন—মা যদি তাকে জীবিতা দেখতে চায় তা হলে পুনর্বার যেন এরূপ আদেশ না করে। চারুদত্ত নিঃস্ব তবুও বসন্তসেনা তাতেই নিবেদিতপ্রাণ। তার এই যে প্রেমে একনিষ্ঠতা এই গুণের জন্যই তিনি বারঙ্গনা হয়েও সমাজের আদর্শস্থানীয়া; যে কোন সতী-সাধ্বীর সাথে তুলনীয়া। আর এই গুণের জন্যই বসন্তসেনা বারঙ্গনা হয়েও সমাজে 'বধূ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন।

শূদ্রক পতিতাদের খুব সম্মানের চোখে দেখেছেন। তাদের যার-তার পাশবিক ভোগের সামগ্রী তিনি করেননি। পতিতাদেরও যে রুচিবোধ আছে, প্রাণ আছে, হৃদয় আছে, হৃদয়ে কামনা-বাসনা আছে, বসন্তসেনাকে দিয়েই শূদ্রক তা দেখিয়েছেন। বসন্তসেনার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজার শ্যালক শ-কার (সংস্থানক) প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছে তাকে আয়ত্ত করার জন্য, উপভোগ করার জন্য। প্রশংসা, প্রলোভন, অধিকার-প্রয়োগ কোনটা করতেই সে পিছপা হয়নি। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। চারুদত্তপ্রাণা বসন্তসেনা লম্পট শ-কারের হাতে একবার আটক পড়ে প্রাণ পর্যন্ত দিতে যাচ্ছিলেন তথাপি শ-কারের কথায় রাজী হননি। শ-কারের কথায়

রাজী না হলে মৃত্যু অবধারিত জেনেও তিনি চারুদত্তকেই স্মরণ করেছেন—"নম আর্যচারুদত্তায়।"—আর্য চারুদত্তকে নমস্কার (অষ্টম অংক)। ৪র্থ অংকে বসন্তসেনার বাড়ীটির যে বর্ণনা শূদ্রক দিয়েছেন তাতে পতিতাদের আভিজাত্যের কথাটাও তিনি কৌশলে প্রকাশ করেছেন। চারুদত্তের বিদূষক মৈত্রেয়-ও বসন্তসেনার বাড়ী দেখে বিস্মিত হয়েছে।[৫] বসন্তসেনার বাড়িটি ছিল কয়েকমহল বিশিষ্ট একটি রাজপ্রাসাদের মত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখায় কোথাও পতিতাদের এমন আভিজাত্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাইনে। অবশ্য 'শ্রীকান্তে' পাটনায় রাজলক্ষ্মীর বাড়ীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে রাজলক্ষ্মীর রুচিবোধের ও আভিজাত্যবোধের কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে। তবে বসন্তসেনার তুলনায় তা নগণ্য। বসন্তসেনা শ-কারের কথায় রাজী হলে তিনি রাজ-অনুগ্রহ লাভ করতে পারতেন। তাতে তার পার্থিব উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চারুদত্তের আর্থিক অবস্থা তখন ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু বসন্তসেনা এ সুযোগের প্রত্যাশী ছিলেন না, তাই অতি সহজেই শ-কারের প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে তার যে উদারতার পরিচয় মেলে তা সত্যিই দুর্লভ। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখীর সঙ্গে বসন্তসেনার কিছুটা মিল আছে। চন্দ্রমুখীও দেবদাসের প্রেমে পড়ে পতিতাবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছিল। তবে অন্যান্য বিষয়ে এ দু'য়ে অনেক প্রভেদ।

শূদ্রকের মধ্যে দরিদ্রপ্রীতির-ও পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। তিনি দরিদ্রদের কষ্টকর অবস্থার বর্ণনাও করেছেন আবার তাদের সাহায্যও করেছেন। আগেই বলেছি—চারুদত্ত একসময় বণিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তখন তাঁর বাড়ীটি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীতে সবসময় গমগম করত। তাঁর বাড়ীর খাবারের উচ্ছিষ্ট খেয়ে হাজার হাজার রাজহংস, পশু-পাখী নিশ্চিন্তে জীবন ধারণ করত। আজ আর সে দিন নেই। বন্ধু-বান্ধব কেউ তাঁর বাড়ীতে আসেনা। খাবারের উচ্ছিষ্ট যেখানে ফেলা হত সে স্থানটা আজ জঙ্গলে ঢেকে গেছে। তাই রাজহংসাদির কলনিনাদ-ও আর শোনা যায়না। তাঁর সার্বক্ষণিক সহচর মৈত্রেয় সারাদিন এ-দিক সে-দিক ঘুরে-ফিরে খেয়ে-দেয়ে রাত্রে এসে চারুদত্তের গৃহে ঘুমায়। এ সম্পর্কে বিদূষকই বলছে—পূর্বে যে আমি চারুদত্তের গৃহে প্রতিদিন সুস্বাদু খাবার

খেয়ে রোমন্থনরত নগরের ষাঁড়ের মত দ্বারে বসে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতাম আজ চারুদত্তের দুরবস্থার জন্য সারাদিন যত্রতত্র ঘুরে-ফিরে খেয়ে-দেয়ে গৃহ-পারাবত যেমন আবাস নিমিত্ত সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে আসে, সেই আমিও তাদের মত একটু রাত কাটানোর জন্য সন্ধ্যাকালে চারুদত্তের ঘরে ফিরে আসি—"নগর চত্বরবৃষভ ইব রোমন্থায়মানস্তিষ্ঠামি স ইদানীমহং তস্য দরিদ্রতয়া যত্রতত্র চরিত্বা গৃহপারাবত ইবা বাসনিমিত্তমত্রাগচ্ছামি" (প্রথম অংক)। অর্থাৎ চারুদত্তের পক্ষে এই প্রিয় বয়স্যের আহার যোগানোও আজ-কাল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সংবাহক—যে একসময় চারুদত্তের গৃহে থাকত এবং তাঁর শরীর মর্দন করে দিত আর পরম শান্তিতে দিন কাটাত, আজ সে পথে পথে ঘুরছে। চারুদত্ত তাকে ছেড়ে দিয়েছেন এই জন্য যে তার দু'টো অন্নের সংস্থান করার ক্ষমতাও চারুদত্তের আজ নেই। এ-সব বলে বলে চারুদত্ত করুণ ভাবে শোক প্রকাশ করছেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে আহত হয়ে চারুদত্ত বলছেন—

> দারিদ্র্যান্মরণান্মা মরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
> অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখম্ ।। (প্রথম অংক, শ্লোক-১১)
> (দারিদ্র্য এবং মৃত্যু-এ দু'য়ের মধ্যে মৃত্যুই আমার কাম্য, কারণ মৃত্যুতে ক্লেশ কম কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালা অসীম)।

প্রথম অংকে শূদ্রক দারিদ্র্য-পীড়িত চারুদত্তের এমন মর্মান্তিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

সংবাহক চারুদত্তের আশ্রয় থেকে বের হয়ে জুয়ার দলে যোগ দেয়। গৃহহীনদের যা হয় তা-ই। জুয়া খেলতে গিয়ে জুয়ারী মাথুরের কাছে সে দশটি স্বর্ণমুদ্রার দায়ে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তার পক্ষে এ ঋণ শোধ করা একে-বারেই অসম্ভব। তাই সে পালিয়ে এসে বসন্তসেনার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মাথুর সেখানেই তাকে ধরে ফেলে। এতে সংবাহকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। ঘটনা বসন্তসেনার কর্ণগোচর হলে তিনি ঋণ পরিশোধ ক'রে তাকে মুক্ত করে দেন। এরপর সংবাহক আত্মগোপন ক'রে মাথা মুড়িয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষু[৬] হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্র-ও অবশ্য দারিদ্র্যের দুঃসহ অবস্থা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাদের সাহায্য করতে খুব একটা এগিয়ে যাননি। 'অভাগীর স্বর্গ'-এ

দেখি কাঙালীর মা মৃত্যুর পূর্বে কাঙালীকে বারংবার অনুরোধ উপরোধ করে গেছেন—মৃত্যুর পরে কাঙালী যেন কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে নিজের হাতে আগুন দিয়ে তাকে দাহ করে। অভাগীর দৃঢ় বিশ্বাস—ছেলের হাতের আগুন পেলে তিনি নিশ্চয় স্বর্গে যাবেন। কাঙালীর মা মারা গেলে কাঙালীর বাবা তাদের উঠোনে যে বেলগাছটা ছিল তা কাটতে যায়। হঠাৎ কোথা থেকে যমদূতের মত জমিদারের পেয়াদা এসে তার গালে এক চড় লাগায় এবং গাছ কাটতে বাধা দেয়। উপায়ান্তর না দেখে কাঙালী এক দৌড়ে জমিদারের গোমস্তার কাছে চলে যায়---যদি কোন একটা উপায় হয় এই আশায়। কিন্তু গোমস্তা অধর রায়ের কাছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উপরন্তু গলাধাক্কা ছাড়া আর কিছুই মেলেনা। কাঙালী কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। ঠাকুরদাস মুখুয্যের বাড়ীতে অনেক কাঠ সংগৃহীত হয়েছে। আগামীকাল ঠাকুরদাসের মৃত স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। কাঙালী দৌড়ে গেল সেখানে। কিন্তু অবহেলা আর অপমান ছাড়া কারো কাছে কিছু আর মিললনা। কেউ বলল—"তোরা ছোট জাত, দুলে; তোদের জাতে আবার কে কবে মড়া পুড়িয়েছে রে। হয় মাটিতে পুতে ফেল নয়তো মুখে খড়ের আগুন দিয়ে নদীতে ফেলে দে।" এর পরে কাঙালী আর কি করতে পারে। নিজেদের গাছটাও জমিদারের লোক কাটতে দিল না বরং কাঙালীর কাছে ঐ গাছের দাম পাঁচটাকা চেয়েছিল গোমস্তা অধর রায়। কিন্তু কাঙালীর ঘরে নেই একমুঠো চাল। সে পাঁচটাকা পাবে কোথায়। কাঙালী নিরুপায়। অথচ তার মা হাজার বার অনুরোধ রেখেছিলেন তার মৃতদেহ যেন কাঙালী অবশ্যই পোড়ায়। অগত্যা কাঙালী নদীর চরে গর্ত খুঁড়ে মায়ের মুখে খড়ের আগুন দিয়ে সেই গর্তে পুঁতে ফেলে। খড়ের পাঁজাটা পাশেই ফেলে দিয়েছিল। কাঙালী এক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে তা থেকে একটু একটু করে ধূম উঠছে। শরৎচন্দ্র পারেন নি কাঙালীর এবং কাঙালীর মা'র শেষ সাধ পূরণ করতে।

'মহেশ' গল্পে দেখি মহেশের জন্য গফুরের কি গভীর মমতা। নিজের ঘরে ভাত নেই, অনাবৃষ্টিতে কোথাও এক মুঠা ঘাস নেই। আমিনা বলছে মহেশকে বিক্রী করে দিতে। গফুর একথা শুনতেও পারেনা---এ-কথা যেন তার মর্মে শেল বিদ্ধ করে। ঘরের চালে খড় নেই। নিজেদের পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে; তবু সেদিকে তার খেয়াল নেই। মহেশের ক্ষুধার কথা ভেবে

গফুর ঘরের চাল থেকে খড় টেনে দিচ্ছে; অসুখের ভান করে নিজের এক বেলার খাবার না খেয়ে মহেশকে খাওয়াচ্ছে। অভাবের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে গফুর একবার মহেশকে বিক্রী করেও ছেড়ে দিতে পারেনি। গফুরের এই অবস্থায়-ও শরৎচন্দ্র তাকে একটু সাহায্য করতে পারেন নি। অর্থাৎ এমন কেউ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলনা—গফুরকে একটু সহায্য করবে। শরৎচন্দ্র পারেননি মাতৃহীন অসহায় কাঙালীর জন্য কারো কাছ থেকে কিছু বের করতে; পারেননি গফুর কিংবা তার মহেশের জন্য, মহেশকে যারা কিনতে এসেছিল, তাদের কাছ থেকে-ও কিছু বের করতে।

শূদ্রক ও শরৎচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই রাজনৈতিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। তবে শূদ্রকের লেখায় প্রত্যক্ষ এবং শরৎচন্দ্রের লেখায় তা পরোক্ষভাবে দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের রাজনীতিমূলক উপন্যাস একটাই—'পথেরদাবী'। এখানে দেখা যায়—অপূর্ব ছাত্রজীবনে 'স্বদেশ' করত, পরে চাকুরী নিয়ে বর্মায় যায়, সেখানে পরিচয় হয় ধর্মান্তরিত ভারতীয় খ্রীস্টান যুবতী ভারতীর সঙ্গে। ভারতী খ্রীস্টান হলেও বৃটিশ শাসন তার শত্রু। ডাক্তার ওরফে সব্যসাচী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী এক বাঙালী যুবক, বর্মায় 'পথেরদাবী' নামে একটি গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। সংগঠনের সভানেত্রী 'সুমিত্রা'। অপূর্ব এবং ভারতী একসময় 'পথেরদাবী'র সদস্য হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য 'পথেরদাবী' গোপনে অনেক কাজ করে। ডাক্তার ছদ্মবেশে বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ান এবং তার কাজ চালিয়ে যান। 'পথেরদাবী' অবশ্য পরে টেকেনি, তা না টিকলেও উপন্যাসের শেষে বোঝা যায়—ডাক্তারের রাজনৈতিক তৎপরতা থেমে থাকেনি।

শূদ্রক কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'মৃচ্ছকটিকে' দেখি—রাজা পালক ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী, অবিচারী এবং দুষ্ট প্রকৃতির। তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারই ছত্র-ছায়ায় লালিত পাষণ্ডদের অত্যাচারে জনজীবন নিদারুণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল; আইন-কানুনের সুষ্ঠু প্রয়োগ হতনা, দরিদ্রের প্রতি অহরহই জোর-জুলুম চলত। ফলে প্রজারা একসময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শর্বিলক এদের সংগঠিত করে। শর্বিলকের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ গণ-অভ্যুত্থান ঘটায়। পালককে সিংহাসনচ্যুত করে গো-পালক আর্যক-কে সিংহাসনে বসায়। সাধারণ

একজন গো-পালক-পুত্র অর্থাৎ রাখালের পুত্রকে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসিয়ে শূদ্রক যে পূর্ণ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন তা শরৎ-সাহিত্যে একেবারেই অনুপস্থিত। উজ্জয়িনীর মত রাজ্যের সিংহাসনে সামান্য একজন রাখাল-পুত্র অধিষ্ঠান করবে—এ-কথা ভাবাই তো যায় না, অথচ শূদ্রক এমন অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। এতে গণতন্ত্রের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তা সত্যিই অভূতপূর্ব ও প্রভূত প্রশংসাযোগ্য। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং পৃথিবীর কমবেশী প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর দিকে দিকে আজ প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে মঙ্গল আরতির যে মঙ্গল শঙ্খ বাজছে, 'মৃচ্ছকটিকে' ও আমরা এরই প্রাক্-উচ্চারণ শুনতে পাই। শূদ্রক নিজে একজন রাজা হয়েও বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন; সমাজের অসম ব্যবস্থাপনার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন; চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং ছোটর দাবীকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে নিপীড়িত মানবাত্মার জয় ঘোষণা করেছেন। শূদ্রক আজ নেই কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'মৃচ্ছকটিকম্' আজও আপন গৌরবাভায় প্রোজ্জ্বল; চির ভাস্বর; কালের কপোলতলে রেখে গেছে এক নতুন স্বাক্ষর।

শূদ্রক ও শরৎচন্দ্র উভয়ই ছিলেন গুণের পূজারী। জাত-বিচার তাঁরা করেননি—কর্মের মাপকাঠিতে সবাইকে তাঁরা পরিমাপ করেছেন। তবে শরৎচন্দ্র তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারেননি, পক্ষান্তরে শূদ্রক তা পেরেছেন। শূদ্রক গণিকা বসন্তসেনাকে 'বধূ'র আসনে বসিয়েছেন, রাখাল-পুত্রকে রাজা করেছেন, শর্বিলকের মত এক সাধারণ ঘরের ব্যক্তিকে প্রধান-মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন; সংবাহককে করেছেন পৃথিবীর (অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের) সমস্ত বৌদ্ধবিহারগুলোর কুলপতি (সভাপতি), অর্থাৎ যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিয়েছেন। চারুদত্তের মহত্ত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে বেণা নদীর তীরবর্তী 'কুশাবতী' নামক রাজ্যের রাজা করতেও শূদ্রক ভোলেন নি।

পরিশেষে বলতে হয়—শরৎচন্দ্র 'জনদরদী' ও 'কথাশিল্পী' আখ্যায় আখ্যায়িত হলে শূদ্রকও অভিন্ন আখ্যা পেতে পারেন, কারণ শূদ্রক ও শরৎচন্দ্র একই পথের পথিক—সাহিত্য জগতে তাঁরা একই পথে হেঁটেছেন।

বরং শূদ্রকের তুলনায় শরৎচন্দ্র অনেকটা দুর্বল। শরৎচন্দ্র ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে ঘরের ভিতরের বিপর্যস্ত অবস্থাটা দেখেছেন এবং লোকের কাছে তা বর্ণনা করেছেন মাত্র। অপরদিকে শূদ্রক দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছেন এবং বিপর্যস্ত অবস্থাকে সাম্যে এনে সুন্দর করেছেন। শরৎচন্দ্রের ভাষা-প্রয়োগ ও রচনা-শৈলী যেমন সুন্দর, সহজ ও হৃদয়গ্রাহী—শূদ্রকের ভাষা-প্রয়োগ ও রচনা-শৈলীও তেমনি। শূদ্রকের ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল। তাঁর রচনা-শৈলীও পাঠক-চিত্তকে দুর্বারবেগে আকর্ষণ করে। তাঁর বর্ণনা যেন একটি কথা চিত্র। এসব দিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় শরৎচন্দ্র শূদ্রকেরই একটা প্রতিফলিত রশ্মিমাত্র।

তথ্যনির্দেশ

১ সংস্কৃত সাহিত্যে যে কোন সাহিত্যকর্মকেই কাব্য বলা হয়। কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্যকাব্যে নটাদি (অভিনেতাদি)-র উপর রামাদি (অর্থাৎ কাব্যে যাদের চরিত্র চিত্রিত হয় তাদের)-র রূপের আরোপ করা হয়। তাই দৃশ্যকাব্যকে রূপকও বলা হয় ('রূপারোপাৎ তু রূপকম্'।—সাহিত্য দর্পণ)। রূপক দশ প্রকার—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অংক, বীথী ও প্রহসন।

২ শূদ্রক যে রাজা ছিলেন তা তাঁর রচিত 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তি থেকেই জানতে পারা যায়—

"সমরব্যসনী প্রমাদশূন্যঃ কুকুদং বেদবিদাং তপোধনশ্চ।
পরবারণবাহুযুদ্ধলুব্ধঃ ক্ষিতিপালঃ কিল শূদ্রকো বভূব।।" ৫ ।।

(রাজা শূদ্রক ছিলেন সমরপ্রিয়, (যে কোন বিষয়ে) যত্নবান, বেদজ্ঞদের মধ্যে প্রধান, তপস্যায় অগ্রণী এবং শত্রুদের হাতীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে উৎসাহী।) কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এই শূদ্রক কোথাকার রাজা ছিলেন তা নিয়ে। ইতিহাস ও পুরাণে কয়েকজন শূদ্রকের নাম পাওয়া যায়। 'কথাসরিৎসাগর'-এর মতে এক শূদ্রক শোভারতীর রাজা ছিলেন। স্কন্দপুরাণে—অন্ধ্রবংশীর রাজা। 'হর্ষচরিত' ও

'কাদম্বরী' (দু'টি-ই বাণভট্ট রচিত)-মতে বিদিশার রাজা। 'বেতালপঞ্চ-বিংশতি'তে শূদ্রক বর্ধমানের রাজা ছিলেন বলে উল্লেখিত। এ সমস্যার আজও কোন সমাধান হয়নি। কেউ কেউ আবার শূদ্রককে উজ্জয়িনীর রাজাও বলেন।

৩ 'মৃচ্ছকটিক' দশ প্রকার রূপকের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ 'প্রকরণ' শ্রেণীর রচনা। প্রকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে—এর কাহিনী হবে লৌকিক বা কবিকল্পিত। নায়ক—ব্রাহ্মণ অথবা বণিক্ অথবা অমাত্য (মন্ত্রী)। নায়িকা হবে বেশ্যা, কুলবধূ অথবা উভয়ই। প্রধান রস—শৃঙ্গার। অন্যান্য লক্ষণ নাটকের মতই। 'মৃচ্ছকটিকে' এ-সবই বিদ্যমান।

৪ 'রাজা' বলতে এখানে আর্যককে বুঝানো হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানে প্রাক্তন-রাজা পালক উৎখাত হলে আর্যক রাজা হয় এবং দশম অংকে চারুদত্ত-বসন্তসেনার সম্পর্ককে অনুমোদন ক'রে শর্বিলককে পাঠায়।

৫ বিদূষক মৈত্রেয় বসন্তসেনার বাড়ী গিয়ে বহির্দ্বারের ফটক দেখেই বিস্মিত হয়ে গেছে। তারপর একে একে সাতটি মহল (প্রকোষ্ঠ) অতিক্রম করে অষ্টম মহলে (বসন্তসেনার মহলে) প্রবেশ করেছে। তোরণ দেখেই যার বিস্ময়ের অবধি ছিলনা—এই আট মহলের আভিজাত্য ও সৌন্দর্য দেখে তার অবস্থা আর কি হবে তাত বোঝাই যায়। তাই অষ্টম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে সে বলছে—"···। এবং বসন্তসেনায়া বহুবৃত্তান্ত-মষ্টপ্রকোষ্ঠং ভবনং প্রেক্ষ্য যৎসত্যং জানাম্যেকস্থমিব ত্রিবিষ্টপং দৃষ্টম্। প্রশসিতুং নাস্তি মে বাগ্বিভবঃ। কিং তাবদ্গণিকাগৃহমথ বা কুবের-ভবনপরিচ্ছদ ইতি।"—(বসন্তসেনার এই অষ্টম প্রকোষ্ঠ দেখে মনে হচ্ছে আমি বোধহয় ত্রিজগৎকেই একত্রে এক স্থানে দর্শন করলাম। এর প্রশংসা করার ভাষা আমার নেই। এ কি একজন গণিকার বাড়ী, না-কি কুবেরের ভবনের এক অংশ?) বিদূষকের এই কথা থেকেই বোঝা যায় বসন্তসেনার বাড়ীটি কেমন আভিজাত্যমণ্ডিত।

৬ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরই ভিক্ষু বলা হয়। এঁরা মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরিধান করেন এবং চিরকুমার থাকেন।